OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 208 - 217
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস ‘দ্বীপপুঞ্জ’ ও গ্রাম-বাংলার যাপিত জীবন

ড. সুজয় অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দূরশিক্ষা ভবন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান
Email ID : sujoy.adhikari88@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Narendranath Mitra, Village life & Village politics, Problems of Village life, Village life Spent, Spread of various Character, Character Conflict, Psychology of Character, Life Prediction.

Abstract
Narendranath Mitra is one of the Bengali fiction writers of the 20th century. Stories of rural life or the complex psychology of love can be found in his literary spirit. His first novel is called Dwippunja. In this novel, various problems developed in rural life can be found in heart conflicts. The novel begins with a picture of a Saha-community family feud in the village. In the novel characters like Nabadwip and her son Murali and Mangala and her husband Subal, characters like Manorama become the epitome of rural society. The novel main problem is Mangala's complicated relationship with her husband Subal and lover Murali. And this problem has become more complicated in rural life. At the end of the novel, we find new ideas about village life in Subal's self-realization. That is why it can be said that Dwippunja is a worthwhile novel written in the community based and psychologically conscious perspective written in the context of village life.

Discussion

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯০৭ - ১৯৭৫) বিপুল সাহিত্য সম্ভারের অনেকখানি রস গৃহীত হয়েছে পূর্ববাংলার ভূগোল থেকে। পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করা এমন সাহিত্যিকের সাহিত্য চেতনার মধ্যে লব্ধ হয়েছে পল্লীজীবনের কাহিনি, প্রেমের জটিল মনস্তত্ত্ব, ছোটখাটো সমস্যা ও হৃদয় সংঘাতের বাস্তব চিত্র। নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় আটত্রিশটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসগুলির প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন আছে নাগরিক চিন্তাভাবনার জটিল মনস্তত্ত্ব অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় গ্রামীণ পরিবেশ - গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবনযন্ত্রণার গদ্যটীকা। সেক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম দুটি উপন্যাস ‘দ্বীপপুঞ্জ’ এবং ‘রূপমঞ্জরী’ গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত। ১৩৮২ সালের ‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘আত্মকথা’-য় মেলে বাল্য–কৈশোরে ফেলে আসা ফরিদপুর গ্রামের সুখস্মৃতি কিভাবে এই উপন্যাসগুলির উপর ছায়া ফেলেছে। খাল-বিল ভরা নদীপ্রান্তর, সম্প্রদায় ভিত্তিক তথা জীবিকাভিত্তিক পাড়ার বর্ণনা, ধান পাটের সবুজ সমুদ্র– সর্বোপরি গ্রামবাংলার পরিপূর্ণ ছবিগুলিকে লেখক আত্মভাবনার মধ্য দিয়ে এনে উপন্যাসে কালি সৃজন করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম উপন্যাস ‘দ্বীপপুঞ্জ’। উপন্যাসটি প্রথমে ‘হরিবংশ’ নামে ধারাবাহিকভাবে ‘দেশ’ পত্রিকায় (কার্তিক-ফাল্গুন, ১৩৪৯) প্রকাশিত হতে থাকে। পরে ১৩৫৩ সালে ‘পুস্তকালয়’ প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে ‘দ্বীপপুঞ্জ’ নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় বন্ধু সন্তোষকুমার ঘোষের আগ্রহে। এই উপন্যাসে পূর্ববাংলার নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যজীবন তথা ঔপন্যাসিকের নিজের গ্রাম সদরদির মানুষের মুখরিত জীবনযাত্রার দ্বান্দ্বিক তথা আবিল রূপটি অঙ্কিত হয়েছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের মন্তব্যে পাই–

> “‘দ্বীপপুঞ্জ’ সম্পূর্ণ পল্লীজীবনের কাহিনী ও উহার ছোটখাটো সমস্যা ও হৃদয়সংঘাতের মনোজ্ঞ ও বাস্তবানুসারী চিত্র। নানা-পরিবার সমন্বিত, প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও সদ্ভাব-সহৃদয়তার ক্ষণভঙ্গুর ঢেউ এ স্পন্দিত ও এই পারস্পরিক প্রভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষপথ হইতে মুহুর্মুহুঃ বিচলিত সমগ্র গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা এখানে অঙ্কিত হয়েছে।”[১]

‘গ্রাম’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় বেদের মধ্যে। গ্রাম বলতে বোঝানো হয় সমূহের আবাসস্থল। শহর থেকে দূরে কৃষিনির্ভর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত নাতিবৃহৎ লোকালয় হল গ্রাম।

> “দুশো তিনশ বছর আগের অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা গ্রাম শব্দের অর্থ বিকৃত পাই। সে সাহিত্যে গ্রাম সম্বন্ধে চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে – যদি কেউ মূর্খ হতে চাও তবে তিনদিন গ্রামে বাস করবে। অথবা লব্ধজ্ঞান ভুলে যাবে যদি কিছুদিন গ্রামে বাস কর।”[২]

গ্রাম সম্পর্কে এই হীনজাত মনোভাব পোষিত হলেও, উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই পল্লীপ্রসঙ্গ উপস্থাপিত হতে শুরু করে। শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে পল্লীজীবনের সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াস ধরা পড়ে এই সময় পর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীপ্রকৃতির ও তার কথার ‘চকিত উদ্ভাস’ লক্ষ্য করা যায়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক মনীষীদের লেখায় প্রাধান্য পায় গ্রামবাংলার সমাজ পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধর্ম-সংস্কার সংস্কৃতির বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আছে পল্লীজীবনে দলাদলির নগ্নরূপ। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ‘ফুলজানি’, ‘শক্তিকানন’ -এই উপন্যাসগুলিতে ধরা পড়ে গ্রাম জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র।

‘দ্বীপপুঞ্জ’ (১৯৪৭) উপন্যাসটি শুরু হয়েছে গ্রামের মধ্যে সাহা সম্প্রদায়ের পারিবারিক বিবাদের চিত্র দিয়ে। উপন্যাসে নবদ্বীপ ও তার পুত্র মুরলী, মঙ্গলা আর তার স্বামী সুবল এর মতো প্রধান তিনটি চরিত্র ছাড়া আরো কিছু পার্শ্বচরিত্র যেমন নবদ্বীপ, বিনোদ, মনোরমা ও আলতা – সমস্ত প্রধান অপ্রধান চরিত্রের কথনে গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটটুকু রচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত পূর্বে উল্লেখিত যে, দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসে বর্ণিত যে গ্রামের ছবি তা লেখকের পূর্ববঙ্গের স্মৃতিকে মনে করায় – ‘আমার কোনো রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে’। এই উপন্যাসে যে গ্রামটির কথা বলা হয়েছে তা ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। এখানকার বাসিন্দারা একে অপরের জ্ঞাতি সম্বন্ধ। কিন্তু গ্রাম্য অসূয়াজনিত কারণে সেই সম্পর্ক কারও মনে থাকে না।

উপন্যাসটির সূচনাতেই আছে গ্রামবাংলার ছবি। নবদ্বীপ পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনী, সমাজের এজজন মোড়ল। সে এসেছে ছেলে মুরলীর ব্যাপারে কথা বলতে সুবলের কাছে – ‘সমাজে আজও যার কোন প্রতিষ্ঠা হয়নি, গঞ্জে খোলা জায়গায় চট পেতে বসে এখনও যাকে হলুদ আর শুকনো লঙ্কা বিক্রি করতে হয়।’ গ্রাম্য সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হল কর্তৃত্ব জাহির করা। যার টাকা আছে, বাহুবল আছে - কথা তার, কর্তৃত্ব তার। তাই পাড়ার মোড়ল নবদ্বীপ ছেলের ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করতে এলে সুবল মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। কারণ সামাজিক দলাদলি, দরবারের বৈঠক এই সমস্ত ব্যাপারে আলোচনার জন্য সুবলকে না হলে চলে না। যদিও সুবলের মনে হয়েছে –

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মুরলীর এই বিলাসিতায় নবদ্বীপের যেন গোপন প্রশ্রয় আছে, না হলে নবদ্বীপের নিজের রোজগারেই তো সব টাকা, মুরলী তো এক পয়সাও আয় করে না, বাপের কারবার আজও সে মন দিয়ে দেখে না, তবুও কেন নবদ্বীপ তাকে এমন করে টাকা নষ্ট করতে দিচ্ছে! কষ্ট হয়ত নবদ্বীপ পায় টাকাগুলি এমন অপব্যয় হওয়ার জন্য, কিন্তু এক ধরনের আনন্দও অনুভব করে নবদ্বীপ।"[৩]

কারণ নবদ্বীপের ছেলে মুরলীর শৌখিনতা, সাজসজ্জা এবং রমণী লুব্ধতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই ছেলেকে বাগে আনতে চেয়েছে নবদ্বীপ।

এই উপন্যাসটির প্রধান সমস্যা হল মঙ্গলার সহিত তার স্বামী সুবল এবং প্রেমিক মুরলীর সম্পর্ক বিষয়ে জটিলতা। আর গ্রামের জীবনকে কেন্দ্র করেই এই সমস্যার জটিলতা আবর্তিত হয়েছে। মঙ্গলা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সে গৃহবধূ, সুবলের স্ত্রী। সে সামজিক নিয়ম মেনে চলে এবং প্রতিবেশীদের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সন্তানহীনতা ও স্বামীর দরদী ভালোবাসার অভাবে শেষপর্যন্ত তার পদস্খলন ঘটে প্রেমিক মুরলীর সৌজন্যে। উপন্যাসে বিনোদের মতো চরিত্রের সৃজনে গ্রামবাংলায় কীর্তনের পটভুমিটুকুর পরিচয় পাওয়া যায়। বিনোদ একজন কীর্তন গায়ক। সে শহরে যায় কীর্তন গান করতে। পাঁচ-সাতদিন গ্রামে থাকে না। ফিরে এসে কীর্তন গানের আসর বসায় নিজের বাড়িতে। দীঘলকান্তি থেকে নন্দকিশোর গোঁসাই আসেন কীর্তন গান শোনার জন্য। গ্রামের সকল মানুষ এসে ঢলে পড়ে বিনোদের বাড়িতে। কীর্তন গান শোনার পটভূমিতে গ্রাম বাংলার চালচিত্র উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে এভাবে –

> "লোক কি কম হয়েছে পাড়ায়। কোণে কোণে যেখানে যে যতটুকু জায়গা পেয়েছে কেবল ঘর তুলেছে। লাগা-লাগা, ঘিচি-ঘিচি সব ঘর, আর এক একটা ঘরে লোকজন ছেলেপুলে একেবারে ঠাসা। নবদ্বীপ আর একবার আসরটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। সমস্ত বাড়িটায় তিল ধরবার আর জায়গা নেই। ভাবলে বিস্ময় লাগে, একই বংশের একই গোষ্ঠীর লোক এরা, কোন বাড়িতে কেউ হলে কি মরলে, পাড়াসুদ্ধ এখনো প্রায় সকলের অশৌচ হয়। কারো বা ডুবমাত্র, কারো বা তিনদিন, আর দু-একজন পুরুষের মধ্যে হলে তিরিশ দিন। এমনও হয়, একই ঘরে বুড়োকর্তার হয়ত একমাসই অশৌচ পড়ল, আর তার নাতি নাতনীরা ডুব দিয়ে মুক্ত হয়ে এল। সবাই এরা পরস্পরের জ্ঞাতি। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু ছাড়া সব সময় কি সেকথা মনে রাখা যায়?"[৪]

সকলে একে অপরের আত্মীয় কিন্তু জীবন-যাপনে একথা মনে থাকে না – এই গ্রাম্য মনস্তত্ত্বের কথাই লেখক আমাদের বলেছেন।

উপন্যাসে গ্রাম্য পরিবেশে কীর্তন গানের আসর যখন জমে ওঠে সেইসময় বিনোদের বাড়ির পিছনে কলাবাগান থেকে একটু সোরগোল ওঠা শুরু হয়। নবদ্বীপের ছেলে মুরলী ভোগবাসনার আবিল আত্মতৃপ্তিতে মধু সার বিবাহিতা কন্যা রঙ্গীকে 'বুকের মধ্যে উন্মত্তভাবে জড়িয়ে ধরেছিল।' এই ঘটনা পাড়ার মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। পল্লীর নিস্তরঙ্গ ঘোলা জলে একটা ঢিল এসে পড়ে। নবদ্বীপ প্রকাশ্যেই রঙ্গীকে প্রশ্ন করা শুরু করে, নিজের ছেলের দোষ ঢাকবার জন্য মুরলীর সাথে রঙ্গীর দাদু-নাতনীর সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয়। সুবল জানে যে গ্রামের মানুষ হয় কথাকে নয় করতে পারে। সেই কারণে নবদ্বীপ সকলের সামনে রঙ্গীকে ডেকে এর বিহিত করতে চাইলে, সুবল তাতে বাঁধা দেয়। সুবলের কথাতে –

> "এই ভিড়ের মধ্যে সোমত্ত মেয়েটাকে না নিয়ে এলেই আপনার চলবে না। সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে, কেলেঙ্কারির ওপর আর একটা কেলেঙ্কারি করবেন আপনি। জিজ্ঞেসবাদ যদি কিছু করতেই হয়, বিনোদের ঘরের মধ্যে চলুন।' তারপর যারা চারদিকে ভিড় করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> দাঁড়িয়েছিল, সুবল তাদের তাড়া দিয়ে উঠল, যাও, হয় আসরে গিয়ে বস, না হয় বাড়ি চলে যাও। কোত্থেকে একটু গন্ধ পেয়েছে আর সব মাছি এসে উড়ে পড়েছে, সমান।"[৫]

গ্রাম্য জীবনে এই সমস্ত রটনা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেই কথাটিই আবার ধরা পড়েছে যখন মুরলীর বিচার করার জন্য সুবল ও গ্রামের সকলে মধু সার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। মুরলীর অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ সে রঙ্গীর পা ধরে ক্ষমা চাইবে - এই শর্ত সুবল মধু সাকে বলে। কিন্তু রঙ্গীর মার মতো তার পিতা মধু সা-ও এই প্রস্তাবে রাজি হননি। কারণ মেয়ের বাবা হয়ে মধু বোঝে যে গ্রামের সমাজে মেয়ের কলঙ্কের মিথ্যা অপবাদ একবার রাষ্ট্র হয়ে গেলে তার স্বামী তাকে আর ঘরে নেবে না – 'কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেলে যাত্রার চেয়েও বেশি ভিড় হবে।'

কিন্তু সুবল সমাজে নিজের আধিপত্য বিস্তারের একটা সুযোগ পেয়ে নবদ্বীপ ও তার ছেলেকে জব্দ করারা জন্য তাদেরকে একঘরে করে রাখার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবে সুবল সেভাবে সায় না পেলেও, সে নিজে উদ্যোগ নিয়ে বাড়িতে শনি পূজার আয়োজন করে। পাড়ার সকলকে নিমন্ত্রণ করেন নবদ্বীপকে বাদ দিয়ে তাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে। শনি পূজাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে গ্রামবাংলার গড়নটির পরিচয় পাওয়া যায়। পূজার জন্য কুড়ি তিনেক খেজুর গাছ কাটে সেখেদের ইয়াসিন। মধু সা তার বাগান থেকে ছড়া তিনেক কলা আর ফটিক একছড়া কলা দেয়। দুদিন ধরে আলতা ও তার তার মাকে নিয়ে মঙ্গলা ঢেঁকিতে চাল কুটে গুড়োঁ তৈরী করে। সুবল বাজার থেকে দুধ কিনে আনে সঙ্গে আনে গোটা পাঁচেক পিতলের কলসী। কিন্তু পূজার দিনে বাজিমাৎ করে নবদ্বীপই। সে যে গ্রামের আসল মোড়ল এই উপলব্ধি সুবলের হয় যখন তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে সকলে নবদ্বীপ সাহার বাড়িতে নারায়ণ পুজার নিমন্ত্রণ খেতে চলে যায়। নবদ্বীপ গোপনে বাড়িতে নারায়ণ পূজার আয়োজন করে সুবলকে পাল্টা চালে বাজিমাৎ করেছে, -

> "উদ্যোগ পর্বের কথা কিছুমাত্র আগে থাকতে প্রকাশ করেনি। ...সন্ধ্যার সময় বাড়িতে বাড়িতে নিজে এসে প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করে গেছে নবদ্বীপ। দু-চারখানা বাতাসা নয়, বাজার থেকে মণে মণে সন্দেশ আর রসগোল্লা আনিয়েছে, পেট ভরে প্রসাদ বিতরণ করা হবে নিমন্ত্রিতদের।"[৬]

সুতরাং ধর্মীয় সংস্কারকে কেন্দ্র করে এক আধিপত্যবাদের গ্রাম্য দলাদলি ধরা পড়েছে উপন্যাসে।

'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসটিতে গ্রামের সাহা পরিবারগুলির প্রসঙ্গ, কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত জটিলতার কথা, বসন্ত রোগের প্রকোপ, শনি, সত্যনারায়ণ, শীতলা, রক্ষাচণ্ডীর পূজা প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে গ্রামীণ পটভূমিকায় বর্ণিত হলেও উপন্যাসটির মূলকাহিনির ভিত্তি হল সুবল-মঙ্গলা-মুরলীর ত্রিভুজ প্রেম। সুবল গ্রামের সাহা সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি। সংসার জীবনে সে মনে করে নারীর বেশি বিষয়বুদ্ধি না থাকায় ভাল। নিজের স্ত্রী মঙ্গলার খ্যাতির কথা শুনে সুবলের মনে ঈর্ষা হত, সে ভাবত তার যদি একজন রোগাটে আর বোকা স্ত্রী থাকতো সেটাই হত তার কাছে মঙ্গলজনক। সমাজের কাছে আরও মান থাকত তার। গ্রাম্য সমাজে পুরুষপ্রাধান্যের এও একটি নজির বলা যায় পুরুষমনস্তত্ত্বে। সুবল ব্যাবসার কাজে, গ্রাম্যশাসনে যতখানি পটু ততখানি সে স্ত্রী মঙ্গলার মন বুঝতে পারেনি। প্রকৃতভালোবাসা স্ত্রীকে দিতে না পারার অভাববোধ থেকেই মঙ্গলা লম্পট যুবক মুরলীর কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছে একটু একটু করে –

> "সুবলের সহিত সম্পর্কে সুদীর্ঘ আত্মনিরোধই তাহার নূতন আকর্ষণে আত্মসমর্পণের মূল কারণ বলিয়া মনে হয় – তাহার দৃঢ় চরিত্র ও পাতিব্রত খ্যাতির নীচে যে গোপন অতৃপ্তির ফাঁক ছিল সেই ফাঁক দিয়াই কলঙ্কিত প্রেম তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।"[৭]

মুরলী অসৎচরিত্র এবং লম্পট। নারীকে বশ করে তার সাথে খেলাই তার আনন্দ। নারীর মন নয়, শরীরই তার কাম্য। সেজন্য সুবল ও মঙ্গলার সম্পর্কের মধ্যে যে ফাঁক ছিল সেই রন্ধ্রপথেই প্রবেশ করে মুরলীর প্রতি মঙ্গলার তীব্রবাসনা। যা তাকে ঠেলে দেয় মুরলীর প্রতি নিবীড় কামনা আলিঙ্গনে। মঙ্গলার সন্তানহীনতা আর একটা কারণ। নবদ্বীপ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুবলকে পালটা সবুঝ শেখাতে তার বাড়িতে নারায়ণ পূজার প্রসাদ পাঠিয়ে দেয় মুরলীর হাত দিয়ে। সুবলের বাড়িতে প্রসাদ দিতে এসে মঙ্গলার পূজারিনী বেশ দেখে মুরলী মুগ্ধ হয়েছে। তাকে একান্তে কামনা করেছে। অনেক নারীর সঙ্গ লাভ করেছে সে। নারীকে বুকের মাঝে কুক্ষিগত করতে পারার আনন্দই সে ভোগ করেছে। কিন্তু মঙ্গলার এই পূজারিনী রূপ মুরলীর হৃদয় রক্তের সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ তুলেছে। এরই পরিণতিতে গ্রামে রক্ষাচণ্ডীর পূজার দিন মুরলী গোপনে প্রবেশ করে মঙ্গলার ঘরে, তাকে কাছে পাবার তীব্র কামনালব্ধ অনুভূতিতে। সেই সময় মঙ্গলা তাকে যে প্রত্যাখ্যানের বাণী শুনিয়েছিল তার মধ্যে ছিল প্রিয়কে কাছে পাবার তীব্র আহ্বান –

> "সহসা দু'হাতে মঙ্গলার মুখখানি মুরলী তুলে ধরতেই চমকে ওঠে মঙ্গলা আর্তনাদ করে উঠল, পায়ে পড়ি তোমার, আমায় ছেড়ে দাও, ওগো আজ নয়, আজ নয়।"[৮]

উপন্যাসের দশম অনুচ্ছেদে ফাল্গুন মাসে প্রকৃতির বর্ণনার সাথে বসন্ত রোগের প্রকোপের কথা আছে –

> "ফাল্গুন মাস পড়তে না পড়তেই পাড়ায় এবার বসন্ত শুরু হল। আম গাছগুলিতে নতুন বোল এল, গাব গাছের ডালে ডালে তামাটে কচি পাতার উদগম হল, ফুল ধরল মুরলীর চারা গাছগুলিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল বিষ্টু সার নাতি নিমাই সার মার অনুগ্রহ হয়েছে।"[৯]

পূর্বে গ্রামের ঘরে ঘরে এই রোগ যেমন প্রচলিত ছিল তেমন এই মারণ রোগে গ্রামের লোকেরা সেভাবে চিকিৎসা করাতেন না। উপন্যাসে আছে নমঃশূদ্র পাড়ার নন্দর মা এই রোগের খবর পেয়ে নিজেই আসে, মন্ত্র পড়ে, জলপড়া দেয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলে, পথ্য-পথ্যের বিধান করে আর তার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মা শীতলার কাছে রোগীর ইচ্ছামত ও সাধ্যমত মানত করবার অনুরোধ জানায়। উপন্যাসের কাহিনিতে ননীবালার ছেলে নিমাইয়ের গায়ে দু-একটা বসন্তের গোটা উঠতে না উঠতেই ননীবালা খাওয়া-দাওয়া ভুলে ছেলের মায়ের কাছে গিয়ে বসেছে। শাশুড়ী ননীবালা ছেলের বৌ-এর কাণ্ড দেখে দিনরাত তাকে ধমকাচ্ছে। নন্দর মার আশ্বাসবাণীতেও ননীবালার প্রাণ থেকে আতঙ্ক যায় না। এই অংশে গ্রামের মানুষের সরল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক গ্রাম বাংলার মগ্ন রূপটির কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। মঙ্গলা আলতাকে সঙ্গে নিয়ে সে ননীবালার অসুস্থ ছেলেকে দেখতে যায়। অসুস্থ নিমাইয়ের সেবা-যত্ন করে সারাদুপুর আর বিকাল কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে স্বামী সুবলের অবজ্ঞা আর ঔদাসীন্যে মঙ্গলার মন আহত হয়েছে। স্বামীর বিরূপতায় সে পরকীয়া প্রেমের অতলতায় হারিয়ে যেতে বসে।

গ্রামের এই মারণরোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিনোদের মা সৌদামিনী উদ্যোগ নিয়ে পাড়ায় শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পূজার আয়োজন করে। সুবল একাজে চাঁদা তোলার ভার নেয়। প্রতিবেশী কারিগর মদন বৈরাগীর বাড়ি থেকে প্রতিমা আনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য অংশে গ্রামবাংলার নিখুঁত চিত্রটি মূর্ত হয়ে ওঠে। পূজার ব্যবস্থা করা হয় ঘাটের ধারে, হিজল গাছের তলায়। শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পুজো প্রতিবারই হয় বলে এই পূজার আর এক নাম ঘাট পুজো। গ্রামবাংলার লৌকিক দেব-দেবীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তার পরিচয়টিই এই অংশে সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে –

> "আগের দিন বিকেলে সৌদামিনী, আলতা আর তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটের ধারে হিজল গাছের তলাটা ভালো করে ঝাঁট দিয়ে গোবর জল ছিটিয়ে এল। পরদিন ভোরে গোবরের লেপ পড়ল আর একবার দণ্ড চারেক বেলা হতে না হতেই লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল ঘাট। মদনের বাড়ি থেকে মাথায় করে প্রতিমা নিয়ে এল ছেলেরা। শীতলা আর রক্ষাচণ্ডী। শীতলার হাতে ঝাঁটা মাথায় কুলো, চম্পকবর্ণা। রক্ষাচণ্ডীর চার হাতে, শঙ্খ, চক্র, পদ্ম আর বরাভয়। হাত কয়েক ব্যবধান রেখে ছোট দুখানা জলচৌকি পেতে বসান হল প্রতিমা। ঘাটের কাছাকাছি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> যে সব বাড়ি, সেই সব বাড়ি থেকে আসতে লাগল মাদুর, শঙ্খ, ঘণ্টা ঝাঁজ। বারকোষ ভরে ফুল বেলপাতা পুজোর বিচিত্র রকমের উপাচার।"[১০]

পূজা উপলক্ষে গাঁয়ের বউ-ঝিদের পৃথিবীটা একটু বড় হয়ে ওঠে। কারণ সারাটা বছর তাদের কাটে রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে কিংবা শাশুড়ি ননদের অভিজ্ঞতায় পুকুরের ঘাট কিংবা নদীর ঘাট পর্যন্ত। তাদের পৃথিবী আজ অনেকখানি বিস্তৃত হয়। আজ তারা সমস্ত গাঁ, গাঁয়ের সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে পাবে। পূজা উপলক্ষ্যে সিন্দুরের পুত্তলি আঁকা নতুন দুখানা বড় বড় কুলো শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পায়ে ছুঁইয়ে আনা হয়েছে। এই কুলো নিয়েই মেয়েদের দল মাগুনে বেরোবে। মঙ্গলা পুরনো সেই লালপেড়ে গরদের শাড়িখানা পড়েছে। বিষ্টু সার বউ মঙ্গলার দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাকেই মঙ্গলচণ্ডীর সাক্ষাৎ মূর্তি হিসাবে তুলনা করে ফেলে। নিমাইকে মঙ্গলা নিজের ছেলের থেকেও বেশি সেবা শুশ্রূষা করেছে একথা যেমন বলে তেমনি নিমাই তার ঠাকুমাকে জানিয়েছে –

> "ঠাকুমা আমার কাছে এসে মা রক্ষাচণ্ডী বসেছিল, আমি স্বপ্নে দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, আহা! তাই যেন হয়। আমার মা মঙ্গলার হাত দিয়ে রক্ষাচণ্ডীই তোকে যেন রক্ষা করেন।"[১১]

সুতরাং মঙ্গলার সম্পর্কে নিতাইয়ের ঠাকুমার একটা সপ্রশংস দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম থেকেই ছিল। অন্য একটি বিষয়ও এখানে ভাববার যে দেবদেবী দর্শনের সাথে স্বপ্নের যে প্রচলিত লোকবিশ্বাস গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত তাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে এই সরল মানুষগুলোর কথালাপের মধ্য দিয়ে।

রক্ষাচণ্ডীর কুলো নিমাইয়ের ঠাকুমা মঙ্গলার কাঁখে প্রথম তুলে দেবার কথা বললে মুরলী কিন্তু তার স্ত্রী মনোরমার পক্ষ নেয়। তার স্ত্রী তথা তাদের বংশের স্ত্রীদের দ্বারাই কুলো তোলার যে প্রথা চলে আসছে সেটাই বহাল থাকবে- একথাই সে জানিয়ে দেয়। মুরলী হয়তো সেভাবে অপমান না করলেও, অপমানিত আহত মঙ্গলা পুজো ছেড়ে আনমনে নিজের বাড়ি চলে আসে। কিন্তু বাড়িতে পা দিতেই মঙ্গলা চমকে ওঠে –

> "উঠানের ওপর সজনে গাছটির ধারে কে ওখানে দাঁড়িয়ে, ও বাড়ির মুরলীর মতো মনে হচ্ছে না! আরো কয়েক পা এগোতেই মঙ্গলার আর কোন সংশয় রইল না মুরলীই। বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল।"[১২]

মঙ্গলাকে সকলের সামনে অপমান করার যে অপরাধ সে করেছে তাতে মাপ চাইতে এসে মঙ্গলার অভিমান ভরা কণ্ঠের পরিচয় মুরলী অনুভব করে। বারান্দা থেকে সোজা ঘরের মধ্যে এসে মুরলীর কামনা তাড়িত চোখের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা ভয় পায় হরিণীর মতো – যা মুরলীকে মুগ্ধ করে। এই অংশটিতে মঙ্গলাও মুরলীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। স্বামীর ভালোবাসা, সন্তানস্নেহ থেকে বঞ্চিতা এক নারী শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে অবৈধ প্রেমের কাছে –

> "সুবল-মঙ্গলার সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটা গোপন ফাঁক ছিল, সেই রন্ধ্রপথেই প্রবেশ করেছিল মুরলীর প্রতি মঙ্গলার তীব্র বাসনা। যা তাকে ঠেলে দিয়েছিল মুরলীর - সান্নিধ্যে ও নিবীড় কামনা আলিঙ্গনে। মঙ্গলা নিজেও জানত না যে মনে মনে সে এটাই কামনা করেছে। তার দৃঢ়তা ও পাতিব্রতকে ছিদ্র করে এই গোপন কামনা তাকে মুরলীর প্রতি ঠেলে দিয়েছে।"[১৩]

গ্রামের উপরিতলের জীবনে এই ঘটনা সেভাবে হয়ত ঢেউ তোলেনি। তবে মঙ্গলার এই কামনা ও পরিতৃপ্তি সুবলের কাছে শেষ অবধি গোপন থাকেনি।

উপন্যাসের কাহিনির অগ্রগতির সাথে মুরলীর প্রতি মঙ্গলার অবৈধ প্রেমের ধূমায়িত শিখা একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শীতলা পূজার সমাপ্তির পরেই নিমাই মারা যায়। নিমাই যে তাকে রক্ষাচণ্ডীর মাতৃমূর্তিতে স্বপ্ন দেখেছিল এবং মুরলীর স্ত্রী মনোরমা যে বিষয়টা নিয়ে উপহাস করেছিল – সেই উপহাসটাই সত্য হয়ে দাড়িয়েছে আজ মঙ্গলার মনের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাছে। উপন্যাসে কীর্তন গায়ক বিনোদও কিন্তু মঙ্গলাকে ভালোবাসত। তবে সেই ভালোবাসায় ছিল শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। সতীসাধ্বী বুদ্ধিমতী সহৃদয়া বলে মঙ্গলার পাড়ায় যত নাম ছড়ায় বিনোদের মন তত গর্বে ভরে ওঠে। কারণ বিনোদের কাছে মঙ্গলার সাথে তার প্রত্যক্ষ যোযাযোগ না হলেও পরস্পরের মধ্যে যে তাদের মিল সেখানেই তাদের আলাপ। তাই যখন মঙ্গলার দুর্নাম রটে গ্রামে তখন বিনোদের তাতে বিশ্বাস হয় না। কীর্তন গানে মনের মধ্যে যে রসের মধুক্ষরণ হত তা স্তব্ধ হয়ে যায় বিনোদের। কীর্তন গানের আসর থেকে নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নেয়। এই উপন্যাসে বালবিধবা আলতার রূপ ছিল না কিন্তু নারী হৃদয়ের রহস্যের গভীরতায় সে বিনোদকেই ভালোবেসেছে। বোকা বিনোদ, ভালো মানুষ বিনোদ, কীর্তনীয়া বিনোদ সকলের চোখে উপেক্ষিত হলেও আলতার কাছে সে 'কিন্নর'। বিনোদ তাঁকে উপেক্ষা করেছে সত্য কিন্তু বিনোদের সহৃদয় সমুদ্রে সে ঝাঁপ দিতে চেয়েছে। আলতার রূপ ছিল না। গ্রাম্য সরল অশিক্ষিতা এই নারীর মঙ্গলার সঙ্গে কথার দ্বন্দ্বালাপে ফুটে উঠেছে সেই কাতরোক্তি–

> "নিজের তোমার রূপ আছে কি না। পাড়া ভরে মানুষ নানা ছলে ঘোমটার ভিতরে তোমার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে কিনা, তাই এ দুঃখের কথা তুমি ভাবতেও পার না। নিজের চোখ-মুখ তো মানুষ নিজে দেখতে পায় না, সেই চোখ-মুখের দিকে অন্যে যখন তাকায়, অন্যে যখন চেয়ে দেখে তখনই তো খেয়াল হয়, চোখ-মুখ বলে একটা জিনিস আমার আছে। না হলে নিজের কথা, নিজের চোখ-মুখের কথা মানুষের কত সময় মনে থাকে বউদি।"[১৪]

বলাভালো উপন্যাসে উক্ত চরিত্রগুলির আধারে গ্রামের মানুষের চারিত্রিক মনস্তত্ত্ব জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বসন্ত রোগে গ্রামে নিধু সার মৃত্যু হলে তার পুত্রদের মধ্যে যে বিবাদ ছিল তাঁকে কেন্দ্র করে মাথা চারা দিয়ে দাঁড়ায় গ্রাম্য দলাদলি। কুঞ্জদের চার ভাইকে হাত করে কিভাবে সুবলকে জব্দ করা যায় নবদ্বীপ সে সম্পর্কে মাথা খেলাতে লাগল। কিন্তু এই গ্রাম্য দলাদলিতে মুরলী তার পিতাকে বাঁধা দেয়। হয়তো মঙ্গলার সাথে যে অবৈধ সম্পর্কে সে লিপ্ত হয়েছিল সেই মনস্তত্ত্বেই। কারণ পাড়ায় আভাসে ইঙ্গিতে এই কথাই গুঞ্জরিত হতে থাকে। মঙ্গলা পাড়ার সবথেকে কাজের বৌ, উৎসব অনুষ্ঠানে সমস্ত কাজকর্মে সে নিপুণ। তাই তার সম্পর্কে এরকম কুৎসিত বার্তা রটলে সুবলের প্রতিবেশী বিষ্টু সা তা বিশ্বাস করতে চাননি। যাইহোক উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে মঙ্গলা মুরলীর বাহুবেষ্টনীর মধ্যে একটু একটু করে ধরা দিয়েছে। সন্তানহীনা এক নারী স্বামীর আপাত নিস্পৃহতায় পরপুরুষের বুকে আশ্রয় নিয়েছে। সেই কারণে আলতা যখন তাকে নারীর রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন মঙ্গলার মনে হয়েছে – 'মঙ্গলার যে রূপ আছে সেটা যেন তেমন কোন বিস্ময়ের বস্তু নয় সুবলের কাছে, গর্ব অহঙ্কারের বস্তু নয়।' হয়তো সেজন্যই মুরলীর কামনাদীপ্ত লোলুপ চোখে নিজের রূপের মাধুর্য মঙ্গলা উপলব্ধি করতে পেরেছে, গুরুত্ব বুঝতে শিখেছে।

মঙ্গলা ও মুরলীর অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি ঘটেছে মঙ্গলার মাতৃত্বে। এই খবরেও গ্রামে তীব্র গুঞ্জরণ সৃষ্টি হয়। গ্রামের রক্ষণশীল পরিবেশে এই খবরের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত –

> "পাড়া ভরে আবার কানাকানি ফিসফিসানি উঠল। চোখ ঠেরে হাসাহাসি গা-টেপাটেপি চলল মেয়ে মহলে। এতদিনে বন্ধ্যাত্বের দুঃখ ঘুচল মঙ্গলার।"[১৫]

আর মুরলী স্ত্রী মনোরমার মুখ থেকে মঙ্গলার মাতৃত্বের খবর জানতে পেরে মুরলীর মনের ভাবান্তর ঘটে। মঙ্গলার গর্ভে তার সন্তান এই খবরে তার মন অন্যরকম হয়ে ওঠে। এতকাল নারী ছিল তার কাছে কেবল দেহসর্বস্ব, শারীরিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মাধ্যম। কিন্তু এই খবরে মঙ্গলার জন্য তার অন্তর আজ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে – 'একথা যদি সত্য তাহলে নতুন করে মঙ্গলাকে পাবে মুরলী, সম্পূর্ণ করে পাবে।' অন্যদিকে মঙ্গলার এই মাতৃত্বের খবরে সুবল মঙ্গলার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পায়। অন্যের বীর্যে নিজের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেখে, নিজের সন্তান দিতে না পারার অক্ষমতায়, ধিক্কারে গ্লানিতে সুবলের মন ভর উঠেছে। অন্যের সন্তান যখন ঘরের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াবে, মঙ্গলা তাকে নাওয়াবে খাওয়াবে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খাবে, এমনকি সুবলের কোলের মধ্যে ঝুপ করে বসিয়ে দেবে – এসব ভেবে সুবলের পৌরুষ

পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবল মঙ্গলাকে মেরে ফেলে না। সুবল মঙ্গলাকে সহ্য করে। কারণ গ্রাম্যজীবনে ঘরের কথাকে সে কানাকানি করতে চায়নি।

মঙ্গলা একদিকে যেমন তার প্রেম ও মাতৃত্বের মহিমাকে অবলম্বন করেছে সেইসাথে সন্তানহীনতার অপবাদ ঘুচিয়ে গোটা সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছে সে ছোট হয়ে গেছে, স্বামীর কাছে সে নষ্টা। তবুও মাতৃত্বের গরিমাকে অবলম্বন করেছে বলেই হয়তো এতটুকু লজ্জাবোধ তার হয়নি। আর মুরলীর প্রতি তার যে আকর্ষণ হয়ত তা স্বাভাবিক ভালোবাসা থেকে জাত নয়। সেই কারণেই লেখক –

> "মঙ্গলার এই অবৈধ প্রেমকে আদর্শমণ্ডিত করেন নাই – ইহা তাহার মনের কক্ষে কক্ষে ধূমায়িত হইয়াছে, কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও অসংকোচ প্রকাশের উগ্রশিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই।"[১৬]

মঙ্গলাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপময় জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য মুরলী তাকে নিয়ে যেতে চাইলে মঙ্গলা রাজি হয় না। কারণ আর যাইহোক 'মুরলী কোনদিন মঙ্গলার স্বামী হতে পারে না।' স্বামীর কথাতে বুড়ো শেওড়াতলায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে পূজা দিতে গেছে মৃত্যুর সংকল্প নিয়ে। কিন্তু আত্মহত্যার সংকল্প করেও, শেষপর্যন্ত সুবলকে অবলম্বন করেই সমস্ত গ্লানি মাথায় নিয়েই; জীবন সমুদ্রে ভেসে থাকতে চেয়েছে। নৌকার খোল যখন জলে ভরে গেছে সেইসময় মঙ্গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে সুবলকে। অদ্ভুদ আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মঙ্গলার মুখ থেকে – 'ওগো বাঁচাও।' বহুকাল বাদে মঙ্গলার কাতর ডাকে সুবলের অন্তরের শুভসত্ত্বা জেগে ওঠে, বৈঠা ফেলে মঙ্গলাকে আঁকড়ে ধরে সুবল –

> "মঙ্গলা কোনো কথা বলে না। আঠার মতো সে লেগে রয়েছে সুবলের দেহের সঙ্গে। সুবল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। জলের মধ্যে মানুষের ভার কমে যায় – এমনকি গর্ভিনী নারীকেও মনে হয় সোলার মতো হালকা।"[১৭]

মঙ্গলার চরিত্রটি আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় –

> "...দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাসে লম্পট মুরলী মঙ্গলার সুপ্ত লিবিডোকে জাগ্রত করে তার সন্তানহীনতার শূন্যস্থানকে মাতৃত্বের গর্বে গরীয়ান করেছে – অমৃত ও হলাহল পান করে একই সঙ্গে মঙ্গলা হয়ে উঠেছে সর্বংসহা। তাই বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলার মত চরিত্র দুর্লভ।"[১৮]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের রূপকার। মানুষের জীবনের 'কুসুম ও কীট' দুই-ই তিনি তার সাহিত্যের মধ্যে রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রথম উপন্যাস দ্বীপপুঞ্জে "পল্লীজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি ও সরল জীবন ধারার মধ্যে যতটুকু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থাকা স্বাভাবিক, লেখক তাহা নিপুণতা ও পরিমিতিজ্ঞানের সহিত পরিবেশন করিয়াছেন।"[১৯] যদিও 'দ্বীপপুঞ্জ' ও 'রূপমঞ্জরী' বাদে তার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আর সেভাবে গ্রামীণ প্রেক্ষিত তথা গ্রামীণ পটভূমির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে কিশোর গল্পগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে লেখকের পরিচিত সেই সদরদি গ্রাম, কুমার নদ, ভাঙ্গার স্কুল ও বাজারের সেই পরিচিত গ্রামের ছবির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামবাংলার সরলতাকে অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায় 'অনাথের কীর্তিকলাপ', 'ঘড়ি', 'মোহনবাঁশি', 'পলায়নপর্ব' ইত্যাদি গল্পগুলিতে।

আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে বলা যায় যে, উপন্যাসটির 'দ্বীপপুঞ্জ' নামকরণের নিহিতার্থতা লুকিয়ে আছে উপন্যাসের সবশেষে সুবলের আত্মোপলব্ধিতে। সুবলের মনে হয় গ্রামের সকল মানুষ নাগরিক ভোগবাদে, বুর্জোয়া স্বার্থপরতায়, স্বার্থচিন্তায় একের থেকে অন্যের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেকারণে, -

> "এখন দ্বীপ দেখাতে বললে সে দেখিয়ে দেবে এখানকার মানুষগুলিকেই। দেখাবে নিজেকে, দেখাবে মঙ্গলাকে, দেখাবে মুরলী আর নবদ্বীপকে।"[২০]

পরবর্তী কালে গ্রাম জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী তারাশঙ্করের উপন্যাসে অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়, তার আগেই তা অর্জন করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষকের আলোচনায় উঠে আসে –

> "তারাশঙ্করের মতো দীর্ঘকাল তিনি গ্রামে ছিলেন না বলে গ্রামীণ আর্থসামাজিক কাঠামোটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় কিছু কম ছিল। সে কারণেই 'দ্বীপপুঞ্জ' যতটা মানব সম্পর্কের কাহিনি থেকে গেছে, ততটা সামাজিক বিবর্তনের কাহিনি হয়ে উঠতে পারেনি। এই ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের প্রতিভার বিচরণ ছিল অনেক বেশী। তবু তারাশঙ্করের আগে গ্রামজীবনকে এভাবে সম্প্রদায়ভিত্তিক সচেতন দৃষ্টিতে আর কোন লেখক দেখেছেন বলে মনে হয় না। তারাশঙ্কর নরেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত নিশ্চয় ছিলেন না। কিন্তু দুজনের চিন্তার খানিকটা সাদৃশ্য প্রমাণ করে যে নরেন্দ্রনাথও গ্রামীণ সমাজ ও সম্প্রদায়কে সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন।"[২১]

সেজন্য 'দ্বীপপুঞ্জ' হয়ে উঠেছে গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত সম্প্রদায়ভিত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা সার্থক উপন্যাস।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৮৪, কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃ. ৭৩৭
২. ভট্টাচার্য, চিন্ময়ী, কথা সাহিত্যে গ্রামবাংলা, ১৯৯৩, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. প্রারম্ভিক 'ক' অংশ
৩. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৭, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ৩০
৫. তদেব, পৃ. ৩৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৬
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৮৪, কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম পুনমুদ্রণ সংস্করণ, পৃ. ৭৩৭
৮. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৭, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১০৯
৯. তদেব, পৃ. ৮৭
১০. তদেব, পৃ. ১০০-১০১
১১. তদেব, পৃ. ১০৩
১২. তদেব, পৃ. ১০৭
১৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, মধ্যাহ্নে থেকে সায়াহ্নে, ২০০৯, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, সংশোধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৫৩
১৪. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৭, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১৮-১১৯
১৫. তদেব, পৃ. ১৪০
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৮৪, কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম পুনমুদ্রণ সংস্করণ, পৃ. ৭৩৮
১৭. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৭, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৫৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 208 - 217
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮. চক্রবর্তী, জয়া, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা সাহিত্য, ২০১৫, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ৫০
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৮৪, কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম পুনমুদ্রণ সংস্করণ, পৃ. ৭৩৮
২০. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৭, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৫৭
২১. পাত্র, অঞ্জুশ্রী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য (গবেষণা পত্র), ১৯৮৮, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩৩৬